Prajñābāridhi : Journal of Multidisciplinary Research

Journal Homepage - https://www.collegetsm.in/college-journal/

শরৎ সাহিত্য: নরনারীর প্রণয় ও বিবাহে সামাজিক বাধা

স্টেট এডেড কলেজ টিচার, বাংলা বিভাগ

তেহাট্টা সদানন্দ মহাবিদ্যালয়, তেহাট্টা, পূর্ব বর্ধমান

ইমেল - koyel.ghosh61@gmail.com

দূরাভাষ - 6295925093

সারসংক্ষেপঃ আমাদের সমাজে নরনারীর প্রেম ও বিবাহকে কেন্দ্র করে নানান সংস্কার, মূল্যবোধ প্রচলিত আছে। সেগুলির উপর ভিত্তি করে মানব জীবন প্রতিনিয়ত বিপর্যস্ত হয়ে পড়ছে । সেই রকমই কিছু সামাজিক প্রথা, সংস্কার শরৎ সাহিত্যের নরনারীদের ওপর কিভাবে প্রভাব ফেলেছে এখন আমরা তা আলোচনা করে দেখে নেব।

সূচক শব্দ: বাল্য প্রণয় , বিবাহ, সমাজ সংস্কার, বৈধব্যযন্ত্রণা, অস্বীকার, নরনারী, দাম্পত্য জীবন

আমাদের সমাজে বিবাহের ক্ষেত্রে গোত্র, বর্ণ, জাতি, ধর্ম প্রভৃতি দিকগুলি দেখা হয়। কোন ঘর থেকে মেয়ে আনা যাবে বা কোন ঘরে মেয়ে দেওয়া যাবে সেই সংক্রান্ত সামাজিক বিধি নিষেধ প্রচলিত আছে। বিবাহ ক্ষেত্রে কৌলিন্য প্রথা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর কারণে বাল্যবিবাহ,বহুবিবাহ জনিত সমস্যা ও বৈধব্য সমস্যা বৃদ্ধি পেয়েছে। সমাজ প্রচলিত কুপ্রথা না মানলে জাতিচ্যুত হতে হয় মানুষকে। রক্ষণশীল পিতৃ তান্ত্রিক সমাজে নরনারীর স্বাধীন ইচ্ছা মতো জীবনসঙ্গী নির্বাচনের কোন অধিকার নেই। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার রক্ষণশীলতার গোড়ায় কুঠারাঘাত

করে। প্রণয় ও বিবাহ সম্পর্কে মানুষ নতুন চেতনায় ভাবতে শেখে। কিন্তু পরিণতিতে বাধা হয়ে দাঁড়ায় সমাজের কিছু অনুশাসন রীতি নীতি কু - প্রথা। ফলে নরনারী প্রণয় - মিলন - বিবাহ স্বীকৃতি পায় না। জীবনে নেমে আসে চরম দুঃখ। শরৎ সাহিত্যে এই চিত্র আনাচে-কানাচে ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে।

শরৎ সাহিত্যে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই বাল্য প্রণয়ের চিত্র দেখা যায় এবং পাঠশালাতেই সেই প্রণয়ের সূত্রপাত। এখানে পাঠশালা বাগদেবীর পীঠস্থান হোক বা না হোক, প্রেম দেবতার পীঠস্থান বটে। যেমন - ' **শ্রীকান্ত** ' উপন্যাসে আমরা দেখি শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রণয় কাহিনী। গ্রামের মনসা পণ্ডিতের পাঠশালা ছিল শ্রীকান্ত রাজলক্ষ্মীর প্রেমের উৎসস্থল। শ্রীকান্তের মারের ভয়ে রাজলক্ষ্মী প্রত্যেকদিন বৈঁচি ফলের মালা গেঁথে এনে দিত। সেই মালা ছোট হলেই পুরানো পড়া জিজ্ঞাসা করে চপেটাঘাত চলত। রাজলক্ষ্মী কুলীন পিতা আর একটা বিবাহ করেন ফলে স্বামী পরিত্যাক্তা রাজলক্ষ্মীর মা ভাইয়ের সংসারে এসে ওঠে। ব্রাহ্মণের জাত রক্ষা করার জন্য রাজলক্ষ্মীর মামা গ্রামের দত্তদের ভঙ্গ কুলীন পাচক ব্রাহ্মণের সঙ্গে সত্তর টাকা পণ দিয়ে দুই বোন রাজলক্ষ্মী ও সুরলক্ষ্মীর বিবাহ ঠিক করেন। কিন্তু ষাট বছরের পাচক ঠাকুর বরপন না পেয়ে বিয়ে অসম্পূর্ণ রেখে প্রস্থান করেন। কৌলিন্যের শিকার হয়ে রাজলক্ষ্মী একজন সমাজ পরিত্যক্তা বাঈজীতে পরিণত হয়। এই পেশায় থাকাকালীন কুমার সাহেবের তাঁবুতে শ্রীকান্তের সঙ্গে আবার তার দেখা হয়। "ছেলেবেলায় একবার যাকে ভালোবাসা যায় তাকে কি কখনো ভোলা যায়?" তাই রাজলক্ষ্মীও ভুলতে পারেনি শ্রীকান্তকে। পরবর্তীতে উপন্যাসে বারবার তারা একে অন্যের বিপদে পাশে থেকেছে। রাজলক্ষ্মী শ্রীকান্ত মিলিত হবার অনেক সুযোগ পেয়েছে। কিন্তু হিন্দু সংস্কার, বঙ্কুর মায়ের মাতৃসত্তা, সমাজ তাদের মিলিত হতে দেয়নি।

এই উপন্যাসের আর এক উল্লেখযোগ্য চরিত্র অন্নদা দিদি - হিন্দু সংস্কারবশত স্বামীর পদসেবা করার জন্য সমাজকে ত্যাগ করেছে। তার কাছে প্রতি পরম গুরু। তার পাদস্পর্শেই সতী নারীর পূণ্য। তাই যে স্বামী তার দিদির সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে তাকে হত্যা করেছে, সেই স্বামীকেই পাবার জন্য ঘর ছেড়েছে, কুলোটা অপবাদ মাথায় নিয়েছে। সুখের জীবনকে পিছনে ফেলেছে - এ কথা জানা সত্বেও যে তার স্বামী ঘৃণ্য ,বর্বর, ব্যভিচারী। ভেবেছে স্বামীর বিচার করার ক্ষমতা নারীর নেই। তাই শত অত্যাচার, লাঞ্ছনা, নির্যাতনেও তার পতিভক্তি বিন্দুমাত্র টলেনি। এই সংস্কার মূলত তাকে সুখের জীবন থেকে দূরে এনে ফেলেছে।

' পল্লীসমাজ ' উপন্যাসে দেখি রমেশ ও রমার মধ্যে ছেলেবেলা থেকেই সুপ্ত প্রেম ছিল। ছেলেবেলায় রমেশ তার মায়ের মুখে শুনেছে রমার সঙ্গে তার বিয়ে হবে। শীতলা তলার পাঠশালায় তাদের বাল্য প্রণয়ের ইতিহাস লুকিয়ে আছে। রমেশ, ঘোষাল বংশের ছেলে। এদিকে রমা মুখুজ্যে বংশের মেয়ে। রমার পিতা এই প্রেম মেনে নেন না। রমার অন্যত্র বিয়ে দেন। কিন্তু রমার অকাল বৈধব্য ঘটায় তাকে পুনরায় পিতৃ গৃহে ফিরে আসতে হয়। তখন সম্পত্তিকে কেন্দ্র করে দুই বাড়ির মধ্যে সংঘর্ষ বিবাদ চরম। বারংবার এই দ্বন্দে দুজনেই পীড়িত হয়েছে। কিন্তু লোক লজ্জার ভয়ে এই বিবাদ থেকে সরে দাঁড়াতে পারেনি। রমেশ অনুভব করেছে রমাকে তার অদেয় কিছুই নেই। বেনী ঘোষাল, গোবিন্দ গাঙ্গুলীর মত সমাজপতিরা রমা রমেশের নামে কলঙ্ক রটনা করে, রমাকে এক ঘরে করার ভয় দেখিয়ে তাকে দিয়ে মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ায় যাতে রমেশের হাজত বাস হয়। সমাজপতিদের অনাচারের জন্য বা সমাজ সংস্কারের জন্য এই দুই নরনারী মিলিত হতে পারে না।

' চন্দ্রনাথ ' উপন্যাসেও আছে বাল্যপ্রেম। সরযুর মা সুলোচনা ভালোবাসতো রাখাল ভট্টাচার্যকে। তাদের বিবাহের পরিবেশও ঘনিয়ে উঠেছিল। কিন্তু সামাজিক কারণে তাদের বিবাহ ভেঙে গিয়েছিল। সুলোচনার বিবাহ হয় অন্যত্র কিন্তু ভাগ্যের দোষে পল্লীসমাজের রমার মত তার জীবনেও ঘনিয়ে আসে অকাল বৈধব্য। পরবর্তীতে সে বাল্য প্রণয়ী রাখালের হাত ধরে পথে নামে, সমাজকে তুচ্ছ করে। কিন্তু মদ্যপ রাখাল সুলোচনার প্রেমের মূল্য দিতে পারেনি। পরিবর্তে তার অলংকার চুরি করে পালিয়েছে। নিয়তির নির্মম পরিহাসে তাকে কাশির হরিদয়াল পান্ডার বাড়িতে রাধুনীর কাজ নিতে হয়। সুলোচনার এই জীবন বৃত্তান্ত কাল হয়ে দাঁড়ায় সরযূর জীবনে। মায়ের কলঙ্ক তার সুখী দাম্পত্য জীবনে দুঃসময় ডেকে আনে। সরযূর স্বামী চন্দ্রনাথের কাকা এই কলঙ্কের কথা জানতে পেরে সরযূকে পরিত্যাগ করে চন্দ্রনাথকে পুনর্বিবাহের বিধান দিয়েছেন। এমতাবস্তায় স্বামীর যথাযথ সমর্থন না পেয়ে সে গৃহত্যাগ করে। আত্মহত্যা করতে পারেনি কারণ সে ছিল সন্তান সম্ভবা। একে অপরকে খুবই ভালোবাসতো তবু সমাজের জন্য তারা একসাথে থাকতে পারছিল না। চন্দ্রনাথ সমাজকে অস্বীকার করে ভালোবাসার মানুষের সঙ্গে ঘর বাধার সাহস দেখাতে পারেনি। তবে দায়িত্ব নিয়ে সরযূর নামে টাকা পাঠাতো। শেষ পর্যন্ত তাদের ভালোবাসা পূর্ণতা পায় কাশিতে ।যে সমাজে তাদের অতীত কেউ জানে না।

' শুভদা ' উপন্যাসে আমরা দেখি বাল্যকাল থেকে নায়িকা ললনার প্রেম ছিল হলুদপুর গ্রামের এক বর্ধিষ্ণু লোকের একমাত্র সন্তান সারদাচরণ রায়ের সঙ্গে। কিন্তু ললনারও পল্লীসমাজের রমার মত অন্যত্র বিবাহ হয় ও দু বছরের মধ্যেই বিধবা হয়ে পিতৃ গৃহে ফিরে আসে। এই সদ্য বিধবার সঙ্গে সারদাচরণের প্রেম চলতে থাকে কিন্তু পরে ললনা বুঝতে পারে এ প্রেম সমাজ মানবে না তাই নিজেকে দূরে সরিয়ে নেয়। কঠোর দারিদ্রের মধ্যে পড়ে পুনরায় সারদাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেয়। কিন্তু বিধবা বিবাহ করলে জাতিচ্যুত ও পিতার সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত হবার ভয়ে ললনার বিবাহ প্রস্তাবকে অস্বীকার করে। দারিদ্র্যের জ্বালায় গৃহত্যাগী হয়। গঙ্গা বক্ষ থেকে একদা জমিদার সুরেন্দ্রনাথ ললনাকে উদ্ধার করে, আশ্রয় দেয়। সুরেন্দ্রর রক্ষিতা জয়াবতীর মৃত্যু ঘটিয়ে এদের সম্পর্কের পূর্ণতা পাওয়ার রাস্তা মসৃণ করেন লেখক কিন্তু সুরেন্দ্র যখন ললনাকে বিবাহ করে সামাজিক স্বীকৃতি দিতে চাই, তখন ললনা তা অস্বীকার করে। তার বৈধব্য সংস্কার ও অধঃপতিত জীবনের কথা ভেবে। অথচ এই বিধবা ললনায় একদিন বাল্যপ্রেমিক সারদাকে বিবাহ করতে অনুরোধ করেছিল। কুলত্যাগ করার পর ললনা ও সুরেন্দ্রনাথ মিলনের মাঝখানে সমাজ ও সংস্কার বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। ললনার জীবনের বিপর্যয়ের জন্য সমাজ সংস্কার অনেকাংশেই দায়ী।

' দেবদাস ' উপন্যাসের কেন্দ্রীয় দুই নরনারী হল দেবদাস - পার্বতী। এদের মধ্যে বাল্য প্রণয় ছিল। পাঠশালাতেই সেই প্রণয়ের সূত্রপাত। শরৎ সাহিত্যে পাঠশালার প্রেম অভিশপ্ত প্রেম। তাই দেবদাস পার্বতীর প্রেম বিবাহের মধ্য দিয়ে সার্থকতা লাভ করতে পারেনি। পার্বতী দেবদাস একে অপরকে খুবই ভালোবাসতো কিন্তু তাদের মধ্যে বিবাহ হল না সামাজিক পারিবারিক কারণে, পল্লীসমাজ উপন্যাসের রমা রমেশ এর মতো। দেবদাসের পিতা এ বিয়েতে রাজি ছিলেন না কারণ পার্বতীদের থেকে দেবদাসদের বংশ গৌরব অনেক বেশি। তারা পাল্টি ঘর নয়। তাই পার্বতীর অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়। পার্বতী বুঝতে পারে বিবাহ বন্ধন ছাড়া কৈশোরের বন্ধন কে চিরস্থায়ী করা যাবে না। তাই পার্বতী সাহস করে বাবার অবাধ্য হয়ে দেবদাসকে বিবাহ করতে বলে। কিন্তু দেবদাস সেই সাহস দেখাতে পারে না। পার্বতী শুরু থেকেই সাহসী, নিজের মেরুদন্ডের উপর দাঁড়িয়ে সামাজিক অনুশাসনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করতে চেয়েছে, কিন্তু দেবদাস তা পারেনি। পার্বতী সখি মনোরমা কে বলেছে দেবদাস ছাড়া সে অন্য কোন পুরুষকে স্বামী হিসেবে ভাবতে পারেনা। তাই প্রেমের অন্ধ আবেগে গভীর রাত্রে সে দেবদাসের ঘরে পর্যন্ত এসেছে। অন্ধ সামাজিক অনুশাসন ও সংস্কার দুই নর-নারীর এইরকম প্রেমময়

জীবনকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে। নিষ্ক্রিয় দেবদাস পরবর্তীকালে পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে বুঝেছে তার জীবন থেকে পার্বতীকে বিসর্জন দিয়ে, তাকে প্রাণঘাতী করার ষড়যন্ত্র করেছে সমাজ ও তার পরিবার। এগুলি আমাদের সমাজের অন্ধ সংস্কার ছাড়া কিছুই নয়। শুধু লোক দেখানো কুল মর্যাদার জন্য দুটি প্রস্ফুটিত জীবন ছন্নছাড়া হয়ে গেল।

' চরিত্রহীন ' উপন্যাসে লেখক মধ্যবিত্ত সামাজিক পরিবেশে দাম্পত্য প্রণয়, দেহ নির্ভর ভোগবাদী প্রণয় ও বিধবার অসামাজিক প্রণয় কে দেখিয়েছেন। বিধবার অসামাজিক প্রণয় বলতে সাবিত্রী - সতীশ এর কাহিনী। নায়ক সতীশ ও বিধবা সাবিত্রীর মধ্যে একটা ভালোলাগা এবং বন্ধুত্বের সম্পর্ক বর্তমান। সাবিত্রী সতীশের কিসে ভালো হয় না হয় সেই সব দিকে সর্বদা নজর রাখে । সতীশ খারাপ বন্ধুর সংস্পর্শে থাকলে সে রাগ করে। এক কথায় দুজনেই দুজনকে পছন্দ করে। কিন্তু সমাজের কথা ভেবে সাবিত্রী দূরে দূরে থাকতে চায়। সতীশ তার মনের কথা জানিয়ে সাবিত্রীকে বিবাহ করতে চাইলেও সাবিত্রী তাতে সম্মত হয় না। কারণ আর কিছুই না সমাজ ও পুরাতন সংস্কার অর্থাৎ বিধবা রমণী সাবিত্রীর প্রণয় জনিত বিবাহে সমাজ বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে।

' শেষের পরিচয় ' উপন্যাসে দেখি সারদা গ্রামের কুলীন ব্রাহ্মণের বিধবা কন্যা। বৈধব্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে গ্রামের জীবন বাবুর হাত ধরে গৃহত্যাগ করে। যে জীবন বাবুকে সে প্রাণের চেয়ে বেশি ভালোবাসতো, বিশ্বাস করতো সেই জীবন বাবু বিবাহের প্রতিশ্রুতি দিয়ে দু'বছর তার সঙ্গে স্বামী স্ত্রীর মতো সহবাস করে। পরে এঁটো পাতার মতো তাকে ত্যাগ করে। লজ্জায়, ঘৃনায়, দারিদ্র্যের জ্বালায় বিষ পান করে আত্মহত্যা করতে যায় সারদা। কিন্তু রাখালরাজের বদান্যতায় সে বেঁচে ওঠে। সারদার এই পুনর্জন্মের পর নানা পরিস্থিতির মধ্য দিয়ে দুজনের মধ্যে প্রনয়ের সঞ্চার হয় সারদার কাছে এই প্রণয় ছিল শ্রদ্ধা মিশ্রিত ভালোবাসা। কিন্তু রাখালরাজ সমাজ অন্ধসংস্কার মুক্ত হয়ে তাকে স্বীকার করতে পারেনি। সারদা ছিল বিধবা, সমাজ নিন্দিতা, কলঙ্কপূর্ণ নারী তাই তাকে স্ত্রীর মর্যাদা দিতে পারে না রাখালরাজ। এই প্রণয়েও বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে সামাজিক সংস্কার গুলি।

' বড়দিদি ' উপন্যাসে দেখি বিধবা মাধবীর সুরেন্দ্রনাথের প্রতি ভালোবাসা জন্মেছিল তার অদ্ভুত চরিত্র দেখে। সে কোন কিছুরই খেয়াল রাখত না। এরকম ব্যক্তি মাত্রই সকলের স্নেহ ও কৃপার পাত্র হয়ে থাকে, সুরেন্দ্রনাথও

প্রথম দিকে মাধবীর কাছে তাই ছিল। মাতৃ স্নেহে খেয়াল রাখার চেষ্টা করত। কিন্তু ক্রমে তা ভালোবাসায় রূপান্তরিত হয়েছিল। সখী মনোরোমার কাছে সে এক চিঠিতে তা প্রকাশ করে ফেলল - "শুনিতে পাই তাহার পিতা-মাতা আছেন। কিন্তু আমার মনে হয় তাদের পাথরের মতো শক্ত প্রাণ। আমি তো বোধহয় এমন লোককে চক্ষের আড়াল করিতে পারিতাম না।" এই শেষ লাইনেই মাধবীর মনের খবর মনোরোমার কাছে ধরা দিয়েছিল। মাধবী ছাড়া সুরেন্দ্রনাথের যে কত অসুবিধা তা বোঝানোর জন্য অভিমানবসত মাধবী শেষে কাশি চলে যায়। হিন্দু বিধবার আজন্মার্জিত সংস্কারের সঙ্গে নারীর প্রণয় আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব দেখা গেছে। যা মাধবীর সুস্থির জীবনকে অস্থির করে সব ওলট-পালট করে দেয়। হিন্দু বিধবার সংস্কারই তাকে সুস্থ স্বাভাবিক জীবন দিতে পারেনি।

' পথনির্দেশ ' গল্পে হেমনলিনী চরিত্রটিকে বিশ্লেষণ করলে দেখতে পাই - গুনীনের বাড়িতে আশ্রয় লাভ, গুনীনের সঙ্গে একত্র পাঠাভ্যাস, গুনীনের প্রতি প্রনয়ের সঞ্চার, তার বিবাহ, বৈধব্য ও বিবাহের মূল্যহীনতা সম্বন্ধে মত প্রকাশ, শ্বশুর বাড়িতে প্রত্যাবর্তন ও গুনিনের বাড়িতে পুনরাবর্তন এই সকল ঘটনার মধ্য দিয়ে হেমনলিনীর জীবন সর্বদা আন্দোলিত হয়েছে। বিধবা হিমনলিনীর মন সর্বদা অস্থির দোলাচলতায় মত্ত। একবার সে গুণীদা কে ভালোবেসে তার সঙ্গে থাকতে চাইছে আবার পরক্ষণেই বিধবা হিন্দু নারীর সংস্কার তাকে দূরে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এইভাবেই তার জীবন ব্যর্থতায় ভরে গেছে। যদিও স্বামীর মৃত্যুর পর তার মনে কোন বৈরাগ্য দেখা যায়নি। ভেবেছিল সে মুক্ত হয়ে একান্ত প্রণয়াস্পদ গুনিনের কাছে এসে পৌঁছেছে। শেষে পতিভক্তিকে আশ্রয় করে প্রচন্ড ধর্মচর্চা আরম্ভ করলো। ধর্মচর্চার তেজে গুনীনের প্রণয় প্রস্তাবকে প্রত্যাখ্যান করল। অন্তর দ্বন্দে জর্জরিত নারীর এ এক কঠোর সংগ্রাম। একদিকে দুর্দমনীয় হৃদয় আবেগ আর একদিকে ধর্ম বুদ্ধি । শেষে ধর্ম বুদ্ধি জয়ী হয়েছে, সমাজ প্রচলিত সতীধর্মের সংস্কার প্রাধান্য পেয়েছে।

' আলো ও ছায়া ' গল্পে দেখি বাল্যবিধবা ও যজ্ঞদত্তের অবৈধ প্রণয় কাহিনীকে। তারা পরস্পরকে ভালবাসলেও সামাজিক বিধি-নিষেধের কারণে তাদের বিবাহ করা সম্ভব হয়নি। সুরমা যজ্ঞদত্তকে মনে প্রাণে ভালবাসলেও তার সর্বদা মনে হয়েছে যজ্ঞদত্ত বিধবাকে ভালোবেসে তার জীবন নষ্ট করছে। তাই তার জীবনকে সুন্দর করে দেওয়ার জন্য একপ্রকার জোর করে তার বিবাহ দিয়েছে। এই বিবাহে তার মনে যেমন উৎসাহ আছে, তেমনি

নৈরাশ্যও আছে। তার মনে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়েছে। একদিকে গভীর হৃদয়াবেগ অন্যদিকে বৈধব্য সংস্কার এই দুটি বিরুদ্ধ প্রবৃত্তির লুকোচুরি খেলা তার জীবনকে এলোমেলো করে দিয়েছে।

তথ্যসূত্র

১) শ্রী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যয়, 'শরৎ রচনাবলী', শুভম, কলকাতা, ২০১৭

২) ডক্টর অরুন কুমার মুখোপাধ্যায়, 'শরৎচন্দ্র : পুনর্বিচার', দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, ২০০১

৩) সরোজ বন্দোপাধ্যায়, 'বাংলা উপন্যাসের কালান্তর', দে'জ পাবলিশিং , কলকাতা, ২০১২

৪) শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায়, 'বঙ্গ সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা' (তৃতীয় সংস্করণ), মডার্ন বুক এজেন্সি, কলকাতা ১৯৫৬

৫) ডক্টর শুদ্ধসত্ব বসু, 'শরৎচন্দ্রের শ্রীকান্ত', প্রজ্ঞাবিকাশ, কলকাতা, ২০০৯

৬) উজ্জ্বলকুমার মজুমদার (সম্পা:), শরৎচন্দ্র : দেশ কাল সাহিত্য', পুস্তক বিপনী, কলকাতা ২০০০

৭) ডক্টর সুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, 'শরৎচন্দ্রের সমালোচনা সাহিত্য ', কলকাতা, এ. মুখার্জী, ২০০৭

৮) সমরেন্দ্র কুমার জানা, আধুনিক দৃষ্টিতে শরৎ সাহিত্যের সমস্যা বলি, বিবেকানন্দ বুক সেন্টার, কলকাতা, জানুয়ারি ২০১১

৯) শ্রী সুবোধ চন্দ্র সেনগুপ্ত, শরৎচন্দ্র, এ মুখার্জি অ্যান্ড কোং প্রা: লিমিটেড, কলিকাতা, বৈশাখ ১৩৬৮